কলকাতার মুসলিম নারী সমাজ

প্রলয় চক্রবর্তী

এবার বাংলার কলকাতা আর ওপার বাংলার ঢাকা...দুটি রাজধানী শহর। স্বভাবতই দুটি নগরের শিক্ষা—সংস্কৃতি—সাহিত্য—দর্পণ সর্বক্ষেত্রে একটা আলাদা ধাঁচের গতি লক্ষ করা যায়, যা এ দুটি দেশের অন্যান্য সাধারণ শহরগুলির ক্ষেত্রে খুঁজে পেতে রীতিমতো কষ্ট হয়। কলকাতার বুকে যেমন করে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, আমেরিকান লাইব্রেরি, বিড়লা প্ল্যানটোরিয়াম, রবীন্দ্রসদন, অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস, নন্দন, তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান কলেজ মেডিকেল কলেজগুলো খুব সহজভাবে গড়ে উঠেছে। ঠিক একইভাবে ঢাকা শহরের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির মঞ্চগুলির একে একে তৈরি হয়েছে। সুতরাং দুটি শহরের উৎসাহী পাঠক বা দর্শদের ওই সব পীঠস্থানগুলি খুঁজে নিতে দ্বিধা হয়নি।

কিন্তু যে বিষয়টির জন্য এই সমীক্ষামূলক আলোচনাটি করতে চলেছি তা আমাকে বড় বেশি পীড়া দেয়। বিশেষ করে গত ছয় মাস ধরে কলকাতার নির্দিষ্ট চারটি এলাকায় (মেটিয়াবুরুজ-বটতলা, খিদিরপুর, পার্কসার্কাস, রাজাবাজার) কমপক্ষে একশোটি মুসলিম পরিবারের সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা করে এ বিষয়ে যে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাতে করে একটি বিষয় খুবই সহজভাবে সকলে মেনে নিয়েছে যে, ঢাকা শহরের মুসলিম নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে যে অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে, কি শিক্ষা-সংস্কৃতি অথবা সাহিত্য শিল্প-দর্শনে, সর্বস্তরে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কিন্তু কলকাতা শহরের ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্রটি খুবই পরিষ্কার যা শুধুমাত্র আমাদের মনে হয়, এখানকার মুসলিম নারীদের মধ্যেও নানা প্রশ্ন, দ্বিধা, সন্দেহ দিনে দিনে জেগে উঠেছে। বিষয়টিকে নিয়ে একটু ভাববার সময় এসেছে। কারণ ঢাকার মেয়েরা যদি সহজভাবে উচ্চশিক্ষার দ্বারে দ্বারে চলে যেতে পারে কিংবা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মঞ্চে তাদের প্রতিভার স্ফুরণ দর্শক সমাজের কাছে তুলে ধরতে পারে অথবা তাদের আধুনিক চিন্তা-ভাবনার ফসল বিভিন্ন সাহিত্য পত্রপত্রিকায় তুলে ধরতে পারে, তাহলে শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতার মুসলিম মেয়েরা এভাবে একঘরে হয়ে আছে কেন?

যুদ্ধ মানুষকে নতুন চিন্তার খোরাক জোগায়। বিশেষ করে সে যুদ্ধ যদি পররাজ্য আগ্রাসন কিংবা অন্য রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে শুধুমাত্র আপন মাতৃভূমির নিজস্ব শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প মাধ্যমটিকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নটি জেগে ওঠে, তাহলে সেক্ষেত্রে সমগ্র জাতির সার্বিক মননশক্তি নতুন এক খাতে বইতে থাকে। আর যদি সে সময়ে সমগ্র দেশবাসীকে একটি ইস্যুতে কেন্দ্র করে দেশনেতারা উজ্জীবিত করতে পারে, তাহলে বিষয়টি আমৃত্যু গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশের ৭১ সালের যুদ্ধ ঢাকা শহরে এই সোপানটি গড়তে

সহায়তা করেছে। ঢাকা শহরের বহু মুসলিম নারী সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে জীবন দিয়েছে, বহু শিশু মাতৃহারা হয়েছে, বহু ভ্রাতা তার একমাত্র ভগিনীকে মৃত্যুর সাথে লড়তে দেখেছে, অথচ কলকাতার বুকে বসে কোনও মুসলিম রমণীকে কলকাতার হিন্দি বিরোধী আন্দোলনে শামিল হতে হয়নি। মুসলিম রমণীরা বহু দূরের কথা, পুরুষরাই নানা দ্বিধায় রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে কলকাতার ভাষা আন্দোলন অথবা কোনও সাংস্কৃতিক জটিল প্রশ্নের সমাধানে এগিয়ে আসেনি। যার ফলে আজ ঢাকা শহরের...মুসলিম নারী আন্দোলনের অগ্রগতি যেভাবে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে ওখানকার মৌলবাদী শাসক শ্রেণিও বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ সাম্প্রতিককালের 'মুসলিম রাষ্ট্রের' ঘোষণাটিকে ওখানকার হাজার হাজার মেয়েরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে নস্যাৎ করে দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে কিন্তু পাশাপাশি কলকাতার ক্ষেত্রে সাহবানু মামলার বিষযটি তেমন করে গুরুত্ব পায়নি।

গুরুত্ব না পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এর জন্য স্বতন্ত্র ধরনের এক বোধশক্তি থাকা দরকার যা ন্যূনতম সাধারণ শিক্ষা থেকে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু কলকাতার মুসলিম নারীদের অধিকাংশের সে সবের সুযোগ নেই। কারণ আজ থেকে একশো বছর পূর্বে যখন ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরা এদের উচ্চশিক্ষার দ্বারা ব্যাপকভাবে গড়ে তোলবার প্রয়াসে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল, তখন কলকাতর শিক্ষিত হিন্দুসমাজ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। অথচ মুসলিম শিক্ষাবিদরা ইউরোপীয় শিক্ষা প্রচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। রেনেসাঁসের ফলে সারা বিশ্বব্যাপী সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-শিক্ষা-সংস্কৃতিতে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছিল তাকে বর্জন করে, নতুন করে মুসলিম দুনিয়ার প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিল। যার ফলে কিছু মাদ্রাসা জাতীয় স্কুল গড়ে উঠল এবং তাতে করে উচ্চমানের কোনও মানসিকতা গড়বার সুযোগ পেল না। কলকাতার মুসলিম নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তখন পারিবারিক সাধারণ কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল অথচ সে সময়ে পুরনো কলকাতার বিভিন্ন গলিতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ হয়তো সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তা স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষায় সীমিত আছে। উচ্চশিক্ষার দ্বার আজও সাধারণভাবে কলকাতার মুসলিম ছাত্রীদের কাছে স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

আর এ স্বপ্ন চিরদিন থেকে যাবে যদি তাদের আর্থিক সঙ্গতির স্বচ্ছলতা না আসে। কারণ পারিবারিক স্বচ্ছলতা মানসিক চিন্তা বিপ্লবে যথেষ্ট সহায়তা করে। সমীক্ষা নিয়ে দেখা গেছে খিদিরপুর-গার্ডেনরিচে-মেটিয়াব্রুজ বটতলা এই দীর্ঘ এলাকাটিতে (৮০) আশি ভাগ মুসলিম পরিবার আর্থিক অনটনে ভোগে। প্রতিনিয়ত তাদেরকে অর্থনৈতিক সংকটের সাথে লড়াই করতে হয়। পেশাগত কর্ম হিসাবে পোর্ট এরিয়ার ছোটখাটো কাজ কিংবা দর্জির কাজ অথবা ঘুড়ি তৈয়ারির কাজ বা রাজমিস্ত্রির কাজে লিপ্ত থাকে এবং তাতে করে হয়তো দুবেলা ডাল ভাত জুটে যায় কিন্তু মানসিক বিকাশের পথ খোলা থাকে না। এবং

এই আর্থিক সংকট থেকে একে একে অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকা, মদ জুয়ার আড্ডা, অধিক সন্তানের প্রবণতা, স্মাগলিং-চুরি-ডাকাতি-পকেটমারির আধিক্য, নোংরা অপসংস্কৃতিমূলক আনন্দে মশগুল থাকা, সন্তানদের মধ্যে কুশিক্ষা-অশিক্ষা প্রভৃতি বৃদ্ধি করাতে সহায়তা করে। যেখানে পুরুষ মানুষগুলোর সুচিন্তা ভাবনার সময় নেই, সেখানে আরও অধিকমাত্রায় পিছিয়ে থাকা কলকাতার সমগ্র নারী সমাজের মানসিক বিকাশ কী করে উন্নতি লাভ করবে?

কিন্তু অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা কোনও কারণবশত যেখানে ফিরে এসেছে সেখানেও চিত্র খুব একটা পালটে যায়নি। উপরোক্ত এলাকাগুলিতে কিংবা পার্কসার্কাস-রাজাবাজার প্রভৃতি এলাকাগুলিতে বেশ কিছু স্বচ্ছল পরিবার আছে। অথচ সে সমস্ত অধিকাংশ মেয়েরা শুধুমাত্র সাংসারিক কার্যে লিপ্ত থাকে, খুব বেশি হলে মাধ্যমিক পর্যন্ত মোটামুটিভাবে একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তার বেশি নয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ল-কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়গুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর যদিও বা দু-একজনকে খুঁজে পান, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে তারা কি পরিমাণ পারিবারিক সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। যা কল্পনার অতীত। কারণ আর কিছুই নয়, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে কলকাতার হিন্দু গোড়া পরিবারগুলিতে যে পুরাতন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা বজায় ছিল আজও এই স্বচ্ছল মুসলিম পরিবারগুলিতে যথেষ্টভাবে বিদ্যমান। পাশাপাশি আরেকটা বিষয় ভেবে দেখার আছে। পেশাগত হিসাবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাসিক উপার্জনের পরিমাণ হয়তো বিরাট আকার ধারণ করে কিন্তু সে পেশা মানসিক বিকাশ ঘটার সুযোগ দেয় না। উদাহরণস্বরূপ খুব সহজে বলা যাবে দর্জি-ওস্তাগারদের, বড় বড় ঘুড়ি ব্যবসায়ীদের, হোটেল ব্যবসায়ীদের, পাদুকা শিল্পের ব্যবসাযীরা, বিদেশি দ্রব্যের লেনদেনকারী, বিল্ডিং কন্ট্রাকটাররা প্রভৃতি পরিবারগুলিতে হাজার হাজার অর্থে আনাগোনা হয়। কিন্তু সে অর্থ ধর্মীয় অনুষ্ঠান-মসজিদ নির্মাণ-বিবাহ কিংবা নিত্যনৈমিত্তিক আহার ব্যবস্থা-ঘরবাড়ি নির্মাণ বা পোশাক পরিচ্ছদ অথবা নিম্নমানের সিনেমা ভিডিও ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। সার্বিক নারী শিক্ষার খাতে ব্যয় করার মানসিকতা গড়ে ওঠে না। এগুলো একটু ভেবে দেখার সময় এসেছে।

কলকাতার প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলিতে যেমন হিন্দু বিহারি, উত্তর প্রদেশীয়, দক্ষিণ ভারতীয়, মারোয়াড়ি এবং শিখ, পাঞ্জাবিদের ভিড় বেড়ে চলেছে ঠিক একইভাবে সমীক্ষা করে দেখা গেছে কলকাতায় অবাঙালি মুসলিয় পরিবারের সংখ্যা বেশি। বাঙালির নিজ স্বতন্ত্র ধরনের এক কালচার আছে। তার রক্তের সাথে তার ভাষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, নেতাজি, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর তদের ধ্যান জ্ঞান সর্বক্ষণের চিন্তার খোরাক জোগায়। এটা যেমন কলকাতায় আছে, ঠিক একইভাবে ঢাকা শহরের মজ্জায় মজ্জায় গেঁথে অছে। এবং আমার ধারণা হয়তো একটু বেশি আছে। তা না হলে বাংলা ভাষার জন্য এত মানুষ প্রাণ দিত না। এর কারণ একটাই ওই বাঙালিয়ানা যা তাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিও গড়তে সহায়তা করে। কিন্তু যেহেতু

কলকাতার অধিকাংশ মুসলিম পরিবারে হিন্দি কিংবা উর্দু অথবা মিশ্রিত এক কিম্ভূতকিমাকার কালচার গড়ে উঠেছে। শুদ্ধ করে বাংলা উচ্চারণ তো দূরের কথা, হিন্দিটাও আয়ত্ত্বে নেই। যার ফলে, এক জগাখিচুড়ি বুলি খিদিরপুর-গার্ডেনরিচ-মেটিয়াব্রুজ-পার্ক সার্কাস এলাকাতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। যার ফলে এদের কাছে গালিব-ইক্‌বাল-প্রেমচাঁদ-দিনকার যেমন দূরে, ঠিক একইভাবে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, শরৎচন্দ্র তাদের কাছের লোক নয়। সেকারণে এদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, লালন গীতি, গ্রুপ থিয়েটার, লিটল ম্যাগাজিন, সত্যজিৎ-মৃণালের সিনেমা, শোভাবাজারের যাত্রাপালা, উদয়শংকরের নৃত্য, যোগেশ দত্তের মাইম প্রভৃতি গুরুত্ব পায় না। গুরুত্ব পায় না কলকাতার বইমেলা, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, রবীন্দ্রসদন, নন্দন, বিড়লা প্লানেটোরিয়াম...গুরুত্ব পায় শুধুমাত্র তিনটি জায়গা, যেখানে এদের ভিড় মোটামুটিভাবে দেখা যায়। মুসলিম নারীরাও সেসব দেখার যথেষ্ট সুযোগ পায়, তার একটি চিড়িয়াখানা, দ্বিতীয়টি মিউজিয়াম আর অন্যটি বোম্বাই মার্কা-বিকৃত-যৌন সমৃদ্ধ নাচ-গান-মারপিটে ভার হিন্দি সিনেমার হলগুলি।

আজ থেকে দুশো বছর পূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে টোলের মাধ্যমে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। সে শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য খুব বেশি হলে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান বুদ্ধি হত। এ জাতীয় শিক্ষায় তাবৎ পৃথিবীর সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জানবার সুযোগ ছিল না। যার ফলে পুরাতন সীমিত এক শিক্ষাজনের মধ্যে জীবনকে অতিবাহিত করতে হত যা আধুনিক বিশ্বের গতিশীল প্রগতিকে সমাজজীবনে ব্যবহারের কোনও সুযোগ ছিল না। বতর্মানে আমরা টোলের শিক্ষা বর্জন করে আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছি। এতে যেমন করে বাস্তব জীবনের ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকুরির সন্ধান দেয়, পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বের সম্যক জ্ঞান অর্জনেরও সুযোগসুবিধা আছে। ঠিক একইভাবে মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষার কোনও সুযোগ হয় না। বর্তমান অবশ্য কিছুটা পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে কিন্তু তাতে করে সামগ্রিক কিছু উন্নতি হচ্ছে না। মাদ্রাসা স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক স্তরে যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হয় তা সাধারণত অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ানো হয়। যার ফলে শিক্ষার মান শুধুমাত্র নিম্নগামী হয় না, মানসিক বিকাশের পথও শিথিল হয়ে যায়। আগামী দিনে মাদ্রাসা স্কুলের ছাত্রদের কাছে উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুব সহজভবে বন্ধ হয়ে যায়, কারণ প্রতিযোগিতা আজ সর্বস্তরে।

আল-কোরান কিংবা হাদিস-শরিফ অনুযায়ী সংগীত-অঙ্কনশিল্পনৃত্য-অভিনয় মোটামুটিভাবে নিষিদ্ধ নয়। যে যে নিষেধগুলি ওই গ্রন্থ দুটিতে করা আছে তা ধর্মের অনুশাসন-এর সময়োপযোগিতায় বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আজকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা সামাজিক অবস্থা মানব জীবনকে বাস্তবমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক হতে বাধ্য করেছে। যার ফলে আজ থেকে পনেরোশো বছর পূর্বে যে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রয়োজন ছিল না আজ হয়তো সার্বিক কারণেই গড়ে তুলতে হয়। তাছাড়া মোটামুটিভাবে সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন

কাজকর্মে পুরুষ এবং নারী সমান তালে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং যেখানে মুসলিম পুরুষেরা খেলাধূলা, সংগীতচর্চা, অভিনয়, শিল্পকলায় পারদর্শী হতে দ্বিধা বোধ করছে না, সেখানে নারীদের জন্য আলাদা বিধানের প্রশ্ন ওঠে না। আর যদিও বা উঠানো হয় তবে ধরে নিতে হবে একশো বছর পূর্বে হিন্দুসমাজে যে পুরাতন গোড়াপন্থী কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ কর্তারা নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত নিয়মশৃঙ্খলার বাঁধন সৃষ্টি করে সমগ্র হিন্দু নারী জাতিকে জোরপূর্বক পশ্চাতে রেখে দিয়েছিলেন, আজও হয়তো ওই একই কায়দায় মুসলিম সমাজের মৌলবাদী গোষ্ঠীরা ধর্মীয় অনুশাসনের নামে এক অবৈজ্ঞানিক, অসামাজিক প্রথা চালু রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। যাতে করে তাদের সামাজিক শোষণটিকে আরও দৃঢ়ভাবে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে।

এক্ষেত্রে শিল্প সংস্কৃতির পশ্নে দু-একটি কথা বলা একান্তই পয়োজন, কাবণ সমীক্ষা চলাকালীন বহু পরিবার থেকেই এই চারটি বিষয়খে খুব গুরুত্ব সহকারে উত্থাপন করা হয়েছে।

প্রথমত, কলকাতার অধিকাংশ মুসলিম সংগীত শিল্পীরা তাঁদের নির্দিষ্ট বংশপরম্পরায় ধারণা অনুযায়ী সংগীতচর্চা কিংবা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যার ফলে নিজস্ব ঘরানা ও কায়দার আলাদা একটা ইজ্জত ও গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে কোনও ছাত্রছাত্রীদের কাছেই এটিকে বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ উপদেশ দেওয়া হয়। যা চিরাচরিত প্রথায় প্রতিটি শিষ্য-শিষ্যা গুরু পরম্পরায় মেনে আসছে। কিন্তু নিজস্ব পারিবারিক কারণেই নিজ কন্যা বা ভগ্নীকে 'বিবাহ উপলক্ষ্যে অন্য গৃহে চলে যেতে হয়। এক্ষেত্রে যদি নিজস্ব শিক্ষার হস্তান্তর অন্য পরিবারে অবমাননার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে তা সুখদায়ক হয় না। তাই পুরাতন এক চিন্তাভাবনার সহজেই কার্যকরী হয়। পিতার শিষ্য পুত্র-পৌত্র বংশ-পরম্পরায় সহজভাবে চলতে থাকে। কন্যা কিংবা ভগ্নীর ক্ষেত্রে পুরাতনি ভাবধারা দৃঢ়ভাবে কাজ করে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক নিজস্ব পারিবারিক পেশাগত গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিভাজনের ভয়ে নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিবাহ বন্ধন গড়ে তোলা হয়। এর ফলে বিভিন্ন পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-সংস্কৃতি-অভিরুচির বিনিময় হয় না। মানসিক চিন্তাভাবনার ফসল ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে না। বরং কুয়োর ব্যাঙের মতো ছোট এক জগতের মধ্যে নিজেদের কুক্ষিগত থাকতে হয়।

তৃতীয়ত, ঢাকা শহরের বুকে প্রতিটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ কিংবা বেতার কেন্দ্র অথবা দূরদর্শন কেন্দ্রগুলিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বেশি। কারণ শহরটিতে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলিম পরিবার বাস করে। যার ফলে খুব সহজেই স্বল্প বিদ্যাতেও সুযোগের আশা থাকে, যা কলকাতার বুকে বসে খুব সহজে সম্ভব হয় না। বিশেষ যোগ্যতা না থাকলে সুযোগ পাওয়ার আদৌ কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কারণ অনেকক্ষেত্রেই যেটি সহজভাবে লক্ষ করা যায় যে অযোগ্য শিল্পীরা দুট শহরেই সমান তালে তাদের যোগ্যতার বহর দেখাচ্ছেন। সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান কিংবা যোগদানের সুযোগের সংখ্যা সীমিত হতে বাধ্য।

চতুর্থত, খুব দুঃখের সাথে একটি অপ্রিয় সত্য কথা প্রকাশ করতে হচ্ছে, যা হয়তো কলকাতার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ অস্বীকার করতে পারবে না। যদি কোনও সংস্কৃতিবান উচ্চশিক্ষিত মুসলিম পরিবার হিন্দু সমাজের সুস্থ পরিবেশে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অজুহাতে তাদেরকে সে সুযোগ খুব কম দেওয়া হয়। অর্থাৎ যে কোনও কারণবশত হোক পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত পরিবার বসবাস করার হার্দিক মানসিকতা আজও নেই। অথচ আমরা নিজেদেরকে বামপন্থী, সেকুলার, প্রগ্রেসিভ আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। আমি ব্যক্তিগতভাবে বহু মুসলিম পরিবারকে জানি যারা শিক্ষিত-ভদ্র-সংস্কৃতিবান হিন্দুসমাজের সাথে মিলেমিশে চলাফেরা করতে চান। কিন্তু তাদেরকে সে সুযোগ ঠিকমতো দেওয়া হয় না। আজ হয়তো কিছু কিছু সরকারি হাউসিং স্টেটে এ জাতীয় ব্যবস্থা আছে। তবে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একঘরে হয়ে আছে। এমনকি কলকাতার বেশ কিছু ব্যক্তিগত স্কুল-প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে মুসলিম সমাজের ভালো ছাত্ররা পড়বার সুযোগসুবিধা সময়মতো পায় না। নানা অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। যার ফলে কলকাতায় বহু শিক্ষিত মুসলিম পরিবার নিজেদেরকে না পারে ওই নোংরা কদর্যময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের সাথে মিলিয়ে দিতে অথচ উচ্চশিক্ষিত হিন্দু সমাজেও তাদের স্থান হয় না। সে কারণে শিক্ষিতা মুসলিম মহিলারা সুস্থ মানসিকতায় সাধারণ জীবনযাপন করতে নানা বাধার সম্মুখীন হন। হয়তো তারা যদি উচ্চশিক্ষিত হিন্দুসমাজে খোলামেলাভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেত, তাহলে তারা নিজেরাও সেই স্তরে যাবার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে পারত এবং তাতে করে জাতীয় সংহতির কিছুটা বাস্তবভিত্তিক নমুনা লোকচক্ষে তুলে ধরা যেত।

আজ থেকে দুশো বছর আগে কলকাতায় যে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, মাঝে মধ্যে কোনও কারণবশত তা স্তিমিত হয়ে গেলেও, আজও সে আন্দোলন থেমে নেই। হয়তো সেই আন্দোলন ভিন্নমুখী ভিন্ন রূপ নিয়েছে। রামমোহন ওই রেনেসাঁসের দিশারি ছিলেন, সময়ের কালে তা পরিবর্তিত হয়ে একে একে ডিরোজিও, বিদ্যাসগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষীর নাম করা যায় যাদের জীবনের মূল লক্ষ ছিল কলকাতার সামাজিক জীবনের মধ্যে নতুন এক শিক্ষা-সংস্কৃতির উপস্থাপনা করা। এবং পরবর্তীকালে কাজি নজরুল, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিরা তাঁদের কর্ম ও লেখনীর সাহায্যে সেই অগ্রগতিকে উজ্জীবিত করেছেন। এতে করে হিন্দুসমাজের যে সমস্ত কুসংস্কারাচ্ছান্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত ছিল, সে সবের বহু পরিবর্তন হয়ে আজকের আধুনিক চেহারা নিয়েছে। আজ কলকাতার কোনও হিন্দু নারী কোনও ক্ষেত্রেই পুরুষদের থেকে পিছিয়ে নেই। একইভাবে ঢাকা শহরে অনুরূপ চিত্র দেখা যাবে। এবং ঠিক একইভাবে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম শহরগুলিতে মুসলিম ধর্মকে বর্জন না করেই সামাজিক বিধি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে। তুরস্কের ইস্তাম্বুল, মিশরের কায়রো, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, ইরানের তেহেরান, রাশিয়া ও চিনের মুসলিম অধ্যুষিত

এলাকাগুলিতে নারীরা কোনও বিষয়ে পিছিয়ে নেই। এর ফলে সেখান ধর্মের কোনও মর্যাদাহানি হয়নি। সুতরাং ধর্মকে বজায় রেখেই সমাজ সংস্কার করা যেতে পারে, যা আমাদের কলকাতার হিন্দু সমাজে হয়েছে কিন্তু মুসলিম সমাজে কিছুমাত্র প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। হয়তো কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাহিত্যের মাধ্যমে অথবা রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষিত বিজ্ঞ মুসলিমরা কিছু কিছু প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্ল্যাটফর্মটি কখনোই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের মতো ধর্মীয় মঞ্চ ছিল না। ধর্ম থকে অনেক দূরে সরে গিয়ে তাঁদের আন্দোলন চালিয়েছেন। যার ফলে সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে কাজি নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলি, আবু সৈয়দ আয়ুব, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, মুজফ্‌ফর আহমেদ, আব্দুল হালিম প্রভৃতিরা কাফের কিংবা নাস্তিক হিসেবেই পরিচিত। সুতরাং সমাজ সংস্কারের আন্দোলনটি ধর্মীয় মঞ্চ থেকে উত্থাপন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে শরিয়াতি আইনের পরিবর্তন-পরিমার্জন-পরিবর্ধন করতে দ্বিধাবোধ করলে চলবে না। কারণ পনেরোশো বছর পূর্বের যে সামাজিক নিয়মগুলি মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল তা তদানীন্তন কালের সময়োপযোগী ছিল। আজ হয়তো বৈজ্ঞানিক কারণেই অনেকগুলি অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। সুতরাং ধর্মীয় নিয়ম ছিল বলেই যে এখনও অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সাংস্কৃতি মঞ্চে মেনে চলতে হবে তার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সর্বোপরি মুসলিম ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা অনেক বেশি বেশি লিবারাল। সেখানে জাতপাতের কোনও বালাই নেই বরং বাস্তবমুখী সাম্যবাদী বহু চিন্তাভাবনা কোরান শরিফ, হাদিস শরিফে আছে। সুতরাং সেগুলিকে মেনেই সামগ্রিকভাবে কলকাতার মুসলিম নারীদেরকে সামাজিক স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে।

* সৌজন্যে : সাহিত্যদর্পণ, ১৩৯৬।